26862 - রোযার বিধান আরোপের মধ্যে নিহিত প্রজ্ঞা

প্রশ্ন

রোযার বিধান আরোপের মধ্যে কী প্রজ্ঞা নিহিত?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।.

এক:

প্রথমে আমাদের জানতে হবে যে আল্লাহর সুন্দর নামগুলোর একটি নাম হলো ‘আল-হাকীম’ তথা প্রজ্ঞাময়। ‘হাকীম’ শব্দটা ‘হুকম’ (বিধান দান) এবং ‘হিকমাহ’ (প্রজ্ঞা) শব্দমূল থেকে উদ্ভূত।

আল্লাহ তায়ালা একমাত্র বিধানদাতা। তার বিধানসমূহে রয়েছে চূড়ান্ত প্রজ্ঞা, পূর্ণতা ও নিপুণতা।

দুই:

আল্লাহ তায়ালা যে বিধানই আরোপ করেন না কেন এর পেছনে রয়েছে সুমহান প্রভূত প্রজ্ঞা। হতে পারে আমরা সে প্রজ্ঞাগুলো জানতে পারব কিংবা আমাদের বিবেক-বুদ্ধি সেগুলোর দিশা পাবে না। আবার হতে পারে আমরা কিছু বিষয় জানতে পারব, আর এর অনেকগুলো আমাদের অজানা থেকে যাবে।

তিন:

আল্লাহ তাআ’লা আমাদের উপর রোযার বিধান আরোপ করা ও রোযা ফরয করার প্রজ্ঞা তাঁর নিম্নোক্ত বাণীতে উল্লেখ করেছেন: “হে ঈমানদারেরা! তোমাদের উপর রোযা ফরয করা হয়েছে যেমনিভাবে তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপরও রোযা ফরয করা হয়েছিল; যেন তোমরা তাকওয়া অবলম্বন করতে পারো।”[সূরা বাক্বারা, আয়াত: ১৮৩]

রোযা তাকওয়া অর্জনের অন্যতম উপায়। তাকওয়া হলো: আল্লাহর আদিষ্ট বিষয়গুলো পালন করা এবং নিষিদ্ধ বিষয়গুলো ত্যাগ করা।

দ্বীনের নির্দেশাবলী পালনে বান্দার জন্য সহায়ক উপায়গুলোর অন্যতম হচ্ছে রোযা।

আলেমগণ রোযা বিধান আরোপের মধ্যে নিহিত বেশ কিছু প্রজ্ঞার কথা উল্লেখ করেছেন। এর সবগুলোই তাকওয়ার বৈশিষ্ট্য। তবে সেগুলো উল্লেখ করতে কোনো বাধা নেই; যাতে করে রোযাদার সেগুলোর ব্যাপারে সচেতন হয় এবং বাস্তবায়নে আগ্রহী হয়।

রোযার বিধানে নিহিত প্রজ্ঞাগুচ্ছের মধ্যে রয়েছে:

১- রোযা নেয়ামতের শুকরিয়া করার অন্যতম উপায়। যেহেতু রোযা মানে হলো: পানাহার ও স্ত্রী-সহবাস থেকে নিজেকে বিরত রাখা। এগুলো হলো সর্বাধিক মহান নিয়ামত। একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত এ নেয়ামতগুলো থেকে বিরত থাকলে এগুলোর মর্যাদা বুঝা যায়। কারণ নেয়ামতগুলো অগোচরে থাকে। কিন্তু যখন হারিয়ে যায়, তখনই এর মর্ম বুঝা যায়। এভাবে রোযা মানুষকে শুকরিয়ার মাধ্যমে নেয়ামতগুলোর হক আদায়ের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে।

২- রোযা হারাম কর্মগুলো ত্যাগ করার অন্যতম একটি মাধ্যম। কারণ ব্যক্তি যদি আল্লাহর সন্তুষ্টি পাওয়া ও তাঁর যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির ভয়ে হালাল থেকে বিরত থাকতে পারে; তাহলে হারাম থেকে বিরত থাকা আরও অধিক যুক্তিযুক্ত। তাই রোযা আল্লাহ কর্তৃক হারামকৃত বিষয়গুলো থেকে বেঁচে থাকার মাধ্যম।

৩- রোযার মধ্যে যৌন কামনার দমন বিদ্যমান। কারণ মানুষ যখন পানাহার করে পরিতৃপ্ত হয়, তখন যৌন-কামনা করতে থাকে। কিন্তু সে যদি ক্ষুধার্ত থাকে, তখন যৌন-কামনা থেকে বিরত থাকে। তাই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: “হে যুবক সম্প্রদায়! তোমাদের মাঝে যার সামর্থ্য আছে, সে যেন বিবাহ করে নেয়। কেননা বিয়ে চোখকে অবনত রাখে এবং লজ্জাস্থানকে সংযত করে। আর যার সামর্থ্য নেই, সে যেন রোযা রাখে। কারণ রোযা তার যৌন-চাহিদাকে দমন করে।”

৪- রোযা নিঃস্ব ব্যক্তিদের প্রতি অনুগ্রহ ও দয়া করাকে অনিবার্য করে তোলে। রোযাদার যখন ক্ষুধার জ্বালা অনুভব করে, তখন তার মনে পড়ে এমন ব্যক্তির কথা যে সবসময় এমন অবস্থায় থাকে। ফলে তার হৃদয় নিঃস্ব ব্যক্তির প্রতি দ্রুত গলে যায়, তার প্রতি দয়ার্দ্র হয়, তার সাথে সে সদাচরণ করে। তাই রোযা নিঃস্বদের প্রতি অনুগ্রহের কারণ।

৫- রোযা শয়তানকে পরাভূত ও দুর্বল করে দেয়। যার ফলে মানুষকে দেওয়া শয়তানের কুমন্ত্রণার মাত্রা দুর্বল হয়ে পড়ে এবং মানুষের পাপ কমে যায়। যেহেতু “শয়তান আদম সন্তানের শরীরে রক্তের মত চলাচল করে।” যেমনটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন। রোযা রাখলে শয়তানের চলাচলের পথ সংকীর্ণ হয়ে আসে। সে দুর্বল হয়ে পড়ে। তার প্রভাব কমে যায়।

শাইখুল ইসলাম তার ‘মাজমুউল ফাতাওয়া’তে (২৫/২৪৬) বলেন:

“নিশ্চয় খাদ্য-পানীয় থেকে রক্ত তৈরি হয়। মানুষ যখন খায় বা পান করে তখন শয়তানের চলার পথ (রক্ত) প্রশস্ত হয়। আর রোযা রাখলে শয়তানের চলার পথ সংকীর্ণ হয়। তখন মানুষের অন্তর ভালো কাজ করতে আর খারাপ কাজ ছেড়ে দিতে

আগ্রহী হয়ে ওঠে।”[কিঞ্চিৎ পরিমার্জিত]

৬- রোযাদার নিজেকে আল্লাহর নজরদারিতে অভ্যস্ত করে তোলে। তার মন যা কামনা করে সেটা করার সক্ষমতা থাকার পরও সে তা করে না। কারণ সে জানে আল্লাহ তাকে দেখছেন।

৭- রোযার মাধ্যমে দুনিয়া ও দুনিয়ার কামনা-বাসনার প্রতি বিমুখতা সৃষ্টি হয়; আর আল্লাহর কাছে (পরকালে) যা আছে সেটার প্রতি আগ্রহ তৈরি হয়।

৮- রোযা মুমিনদেরকে বেশি বেশি নেক কাজে অভ্যস্ত করে তোলে। কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে রোযাদারের নেককাজ বৃদ্ধি পায়। এভাবে সে নেককাজে অভ্যস্ত হয়ে উঠে।

উপর্যুক্ত বিষয়গুলো রোযার বিধান আরোপে নিহিত কিছু প্রজ্ঞা। আমরা আল্লাহর কাছে করি, তিনি যেন আমাদেরকে এগুলো বাস্তবায়ন করার তৌফিক দান করেন এবং যথাযথভাবে তার ইবাদত পালনে সাহায্য করেন।

আল্লাহ্‌ই সর্বজ্ঞ।

দেখুন: তাফসিরে সা’দী (পৃষ্ঠা-১১৬), ইবনে কাসিম লিখিত ‘আর-রওযুল মুরবি’ গ্রন্থের হাশিয়া (৩/৩৪৪) এবং ‘আল-মাওসূআ আল-ফিকহিয়্যা (৯/২৮)।